রবীন্দ্রনাথের গান ও তার গায়ন
সুধীর চক্র বর্তী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ওসুর করা অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'ধন্য ধান্য পুষ্পভরা' গানটিযখনই আমি শুনি, তখনই ভয়ে কাঁটাহয়ে থাকি।গানটি দ্বিজেন্দ্রলাল রেকর্ডেগেয়েছিলেন, সেকালের এক চওড়া রেকর্ডে, সঙ্গে কোরাসে দোহারকি দিয়েছিলেন তাঁর কিশোর পুত্র দিলীপকুমার ও বালিকা কন্যা মায়া। সেই দুর্লভ ও অ্যান্টিক রেকর্ডটির গানআমি শুনেছিলাম কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পঞ্চাশের দশকে। ১৯১৩ সালে প্রয়াত হন দ্বিজেন্দ্রলাল, কাজেই তার আগে কোনো সময়েরেকর্ডে তিনিএ-গান দিয়েছিলেন। তখনও তো বাংলায় রেকর্ডিং ব্যবস্থা সাবালক হয়নি তাই ধ্বনিগত সমস্যা ছিল, তবে গায়কের সুরোলা গলা ও দৃপ্ত বিশ্বাসের উচ্চারণ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি। কেমন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানের গায়নরীতি, কতটা ওস্তাদি ওকী নিপুণ সুর মিশ্রণের (দেশি বিলাতি) লীলা তা ওই এক রেকর্ডেই স্পষ্ট। পরে দিলীপকুমার ওই গানরেকর্ড করেছেন, তাতে খানিকটা গায়নগত মার্জনা করেছেন, স্বরলিপিও করেছেন। তবু গানটি সুরের দিক থেকে শুদ্ধ চরিত্র রক্ষা করতে পারেনি। তার কারণ দ্বিজেন্দ্রগীতি গায়নের কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড এ দেশে গড়ে ওঠেনি, তাঁর কোনো অছি নেই,তাঁর একমাত্র পুত্রও ছিলেন প্রবাসী। ফলে অমন অসামান্য গানের সুর ও তাল তো বিকৃত হয়েছেই, গায়নও গেছে বদলে। আমার কাঁটা হয়ে থাকার কারণ অবশ্য অন্য আরেক কাণ্ডে। ওই বিখ্যাত বাণী ও বিকৃত হয়ে গেছে। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' হয়েছে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' এবং প্রায়ই শুনি' চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা'র বদলে 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধরা'। দূরদর্শনে কোনো দলের সম্মেলক গানে, সভা সমিতিতে, স্কুল কলেজে এমন ভাষা সংহার প্রায়ই শুনি এবং মনের মধ্যে শোচনা হয়।

পাশাপাশি মনে আসে, রজনী কান্তের গান বা কান্ত গীতির গানের গায়ন বিষয়েকোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি এবং তার প্রচারও অত্যন্ত সীমায়িত। অতুল প্রসাদের ২০৮ খানি গানের বাণী পাওয়া গেছে। তার মধ্যে স্বরলিপি আছে ৬৫ খানি গানের। বাকি গান গুলির বাণী- শরীর শুধু এখন আমরা পেতে পারি বা পড়তে পারি। সন্তোষ কুমার সেনগুপ্ত ১২টি অতুল প্রসাদের গানে সুর দিয়ে রেডিয়ো ও রেকর্ডে প্রচার করেছেন নিজে বা অন্যকে দিয়ে গাইয়ে-কেউ জানতেই পারেননি, প্রতিবাদের প্রশ্ন তো তো ওঠেই না। এব্যাপারে আরেক কাণ্ড করে গেছেন দিলীপ কুমার রায়। অতুল প্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই তাঁর জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে যথেচ্ছ সুরবিহার করে দিলীপ কুমার যেভাবে ও গায়নে অতুল প্রসাদের গান প্রচার করে গেছেন বা অন্যকে শিখিয়ে গেছেন তা বেশ অন্যরকম। সাহানা দেবীর গানে সেই ধাঁচা পাওয়া গিয়েছিল এবং মঞ্জু গুপ্ত-র গানে। সেই গায়নের সঙ্গে অতুল প্রতসাদের গানে বেশিরভাগ গানে আস্থায়ীর পরে তিনটি অন্তরা আছে একই সুরের ছাঁদে দিলীপ কুমার ওই ধাঁচের সুরের ও চলনের একঘেয়েমি কাটাতে কয়েকটি গানের দ্বিতীয় অন্তরাটিতে সুরান্তর ঘটিয়ে প্রায় সঞ্চারীর বৈচিত্র্য এনে ফেলেছেন। তার ফলে গানটি হয়তো সুখশ্রাব্য হয়েছে কিন্তু কোনো ভাবেই তাতে অতুল প্রসাদের সাংগীতিক ইচ্ছাকে মান্য করা হয়নি। সেটা গুরুতর অপরাধ।

এই অপরাধের মাত্রাগত বেশিকম নানা সংগীতকারের গায়ন-পরম্পরার ক্ষেত্রে দেখি, তবে আধুনিক শ্রোতার কাছে তার মূল্য নানারকম। যেমন ধরা যাক, নিধুবাবুর টপ্পা গানের কোনো স্বরলিপি সেকালে করা হয়নি (কেননা স্বরলিপি উদ্ভূত হয়নি তখনও) বলে তার গায়নরীতি ও সুরের ধাঁচা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা যেমন নেই তেমনই কোনো বিচ্যুতির প্রশ্নও নেই। ফলে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় যে'কটি নিধুবাবুর গান রেকর্ড করেছেন তাতে লেখা অছে 'সুরঃ প্রচলিত'। তারমানে পরম্পরাগত একটা গায়নরীতি ও সুর কাঠামো, যা রামকুমারের শ্রুতিবাহিত, সেটাই আমরা শুনি। তাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত অলংকরণ নিশ্চয়ই আছে, আছে ওস্তাদি ও কারদানি।সেটা আমরা মেনে নিয়েছি কেননা বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে আমরা জেনেছি যেনিধুবাবুর গানের কোনো শিল্পী- পরম্পরা বা গায়ন-পরম্পরা নেই, তাই প্রত্যাশা বা প্রত্যাশাভঙ্গের কথা ওঠে না। ওসব গানের কোনো শব্দগত ব্যঞ্জনাও তেমন নেই যাতে সুরবিচ্যুতি বা গায়নরীতি বিভ্রাটের অভিযোগ উঠবে। কথাটা গুরুতর হয়ে ওঠে আধুনিক কালের গানের ক্ষেত্রে, যেখানে গীতিকার এ সুরকার একই ব্যক্তি এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির প্রয়োগগত কৌশল তাঁরই পরিকল্পিত। যেমন ধরা যাক নজলের গান। রেডিয়ো, রেকর্ড, সিনেমা ও থিয়েটার -এতগুলি গণমাধ্যমের জন্য তাঁকে সংগীত সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তাঁর নিজস্ব নজল-বর্গের গানের ঢং তোতাঁরই ভাবনার ফসল। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা ছিল পরিমাণে বিপুল এবং বৈচিত্র্য ব্যাপক। ভারতীয় রাগ রাগিণী, মধ্যপ্রাচ্যের নানা গীতরীতি ও বাংলার লোক গীতির বহুতর ভঙ্গি তাঁর আয়ত্ত ছিল বা অনুসরণের নেশা ছিল। গান ছিল তাঁর পেশা। তাই জনমনোরঞ্জনের কথা সব সময়ে আলাদা ভাবে তাঁকে ভাবতে হয়েছে এবং গড়ে নিতে হয়েছে নতুন নতুন শিল্পী। তাঁরা সবাই মার্জিত সংস্কৃতি সম্পন্ন জগতের শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না।যে-অর্থে গিরিশচন্দ্র নটনটিদের তৈরি করে নিয়েছিলেন সেই অর্থেই নজলকে গড়ে নিতে হয়েছিল তাঁর গানের কারিগরদের। সেই পর্বে শত শত গান রচনার তোড়ে, বিপণন জগতের নিত্য নতুন চাহিদার টানে, রেকর্ড কোম্পানির নানা উদ্ভট প্রত্যাশা পূরণের বাধ্যতায় তাঁর অবকাশ ছিল না সুস্থিতি সম্পন্ন অত্বর সংগীত রচনার শান্ত ধ্যানে মগ্ন থাকার। সাংগঠনিক বোধবুদ্ধি ছিল কম, যতটা মেতেছেন ও মাতিয়েছেন গানে গানে, ততটা ভাবেননি সেই গানের চারিত্র্য নিয়ে বা তার স্থায়িত্ব নিয়ে। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে প্রমত্ত উজ্জীবিত অফুরন্ত নজলগীতি ক্ষণকালের ছন্দে দিশাহারা। তাই বলে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাবার পরিণাম হয়তো ছিল না তার। স্থায়িত্বের নিশ্চিত স্বাক্ষর করার প্রবণতা ছিলনা -যদিও তাঁর চারপাশে গানজানা মানুষের বৃত্ত কখনও আলগা হয়নি। তাঁর গানে অন্য লোক সুর দিয়েছেন, তিনি বাধা দেননি, বরং অনেকক্ষেত্রে তারিফ করেছেন। ফলে তাঁর চেতনকালেই তিনি অসহায়ভাবে দেখতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর গানের চেহারা অন্য গায়করা বদলে দিচ্ছেন কিংবা গানের রাগভিত্তি সম্পূর্ণবদলে যাচ্ছে।

প্রমাণস্বরূপ দেখা যাচেছ, তখনকার 'নবশক্তি ' পত্রিকায় তিনি বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছেন চিঠি লিখে যে, তাঁর সুর-করা গান বেতারে ভিন্ন সুরে এমনকী ভিন্ন রাগে পরিবেশিত হচ্ছে। তখনও বোধশক্তি তাঁর নিশ্চল হয়ে যায়নি, তবুও শুরু হয়ে গেছে নজলগীতির সুরান্তর। তর পর যখন রয়ে গেলেন নজল শুধু জড় পুতুলের মতো নির্বোধ্য বাক্‌শক্তি রহিত,বছরের পর বছর, তখন আমরা দেখেছি নজলগীতিমেধ যজ্ঞ, একাধিক শিল্পীর পরিবেশনায় ভিন্ন ভিন্ন সুরে ও গায়নে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কট্টর ইসলাম পন্থীরা একসময়ে তাঁর গানে শব্দ পাল্‌টে হিন্দুয়ানির চিহ্ মুছতে চেয়েছিলেন। ফলে 'নবনবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মাশান' পংক্তি সংস্কারবাদীদের কলমে বদলে গিয়ে মহাশ্মশান পরিণত

হয়েছিল গোরস্থানে। এ রকম অনেক স্থূল হস্তাবলেপের বৃত্তান্ত এখন পাওয়া যায়- বাংলাদেশের নজল অনুরাগীরাই সেসব তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন।

গানেরওপর এই যে গায়নের দাপট,স্রষ্টার চেয়ে পারফরমারদের ওস্তাদি, তা ভারতীয় গানে খুব নতুন নয় এবং এই জায়গাটায় সব মৌলিক সংগীতকারই অসহায়। রবীন্দ্রনাথ একবার পরিহাস করে তাই বলেছিলেন যে, বনিতা আরগান অন্যের কণ্ঠ আশ্রয় করে বেঁচেথাকে এই এক সমস্যা। এই সমস্যার মূল সংকট ভারতীয়সংগীতের অন্তঃপ্রকৃতিরমধ্যে প্রথম থেকেই আছে-কেননা ভারতীয় সংগীত প্রধানত কণ্ঠাশ্রিত এবং সেউ কণ্ঠ ঘরানা শাসিত। তাই ঘরানার নির্দেশিকা অর্থাৎ গুরু অভিচি অনুযায়ী গানের রূপায়ণ ঘটে তান কর্তব্যের উচ্চাবচ ব্যবহারে এবং যদৃচ্ছ সুরবিহারে। এর ফলে একই খেয়াল বা ঠুংরি একেকঘরানার শিল্পীকণ্ঠে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা শুনি। পরিণামে যা ঘটেছে তাতে গানের স্রষ্টার মূল অভিপ্রায়ের ওপর চেপে বসেছে ঘরানা ও তার রূপায়ণকারী শিল্পীর কর্তৃত্ব। সকলেই স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের গায়নের শুদ্ধতার দাবি রাখেন। শ্রোতা এক্ষেত্রে অসহায়।

সংগীতের সুরের ইতিহাস আমাদের দেশে ফলত উপেক্ষিত। তাই ক্ষতিটা বেশি অনুভব করাযায় ব্যক্তি - সংগীতকারের নিজস্ব সুরুকারের খোঁজ করতে গেলে। যেমন ধরা যাক উত্তর ভারতের কবীরের রচনা, যা প্রধানত বাণী ও বক্তব্যপ্রধান, তার গীতরূপটির পূর্বাপর কোনো স্বীকৃত ধরন নেই। ফলে পালুসকর, কেশর বাইও ভীমসেন যোশী সম্পূর্ণ নিজ নিজ বন্দিশেও স্বরকৌশলে ফুটিয়ে তোলেন কবীর-ভজন। মীরাবাঈয়ের ভজন সম্পর্কেও একই কথা। সেই গানের বাণীতে লৌকিক রাজস্থানি বুলি যেমন শনার্ক করা যায, সুরেও তো তেমনই একটা রাজস্থানি বনিয়াদ খুঁজে পাবার কথা। কিন্তু কোথায় যে তা অন্তর্হিত হল। দিলীপ কুমারের সুরারোপেশু ভলক্ষ্মীর গাওয়া 'মীরা' চলচ্চিত্রের গান আর কয়েক বছর আগের'মীরা' চলচ্চিত্রের অন্তর্গত বাণী জয়রামের গায়ন ও সুর কি এক? একেক সময় এছাড়াও এসে পড়ে কোনো ঐতিহ্যবাহী গানের রূপায়ণে ব্যক্তি -শিল্পীর প্রবল স্বাতন্ত্র্য, যেমন 'উমরাও জান' চলচ্চিত্রের গানে আশা ভোঁসলের কর্তৃত্ব। তবু এখনও অনেকে অনুসন্ধান করতে চান, কেমন ছিল বাংলা পাঁচালি বা কৃষ্ণযাত্রার গানের গায়নরীতি আর সুরের ধরন। এ জাতীয় গীতরীতির আদলমৌখিক শ্রুতিবাহিত থাকার কথা কিন্তু শিল্পীদের ও রূপকারদের পরম্পরা নষ্ট হয়ে গেছে বলে তার ধারণা করাও কঠিন। আসলে ইহলোক উদাসীন ও পারত্রিক ভাবনা সর্বস্ব আমাদের দেশশিল্পকে যত মর্যাদা দিয়েছে, শিল্পীকে বা স্রষ্টাকে ততই করেছে উপেক্ষা। সেইসঙ্গে আমাদের মজ্জাগত ইতিহাস বৈমুখী স্বভাব এবং কালক্রম -অচেতন মানস কোনো কিছুই ধরে রাখতে চায়নি। সেই জন্যই বাংলার টেরাকোটা মন্দিরের নির্মাতা এবং কা ভাস্কর্যের শিল্পীগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত, জাত পরিচয়ও বাস্তুবিবরণ সংগ্রহ করতে ক্ষেত্র গবেষকদের বহু সময় নষ্ট হয়েছে। সব তথ্য পাওয়া যায়নি।

একইরকম অচেতনতা ও ভাবাতিরেকের আতিশয্যে বাংলার অতিসমৃদ্ধ কীর্তন গানের সঠিক রূপরীতি আজ বিতর্কের বিষয়। মনোহরশাহী কীর্তনের স্বরূপ যদিবাকিছুটা আবিষ্কার করা বা অনুমান করা যায় কিন্তু বাংলা কীর্তনের অন্য তিনটি ধারা সম্পর্কে গায়ক মহল ও কীর্তনীয়ারা সুনিশ্চিত ভাবে তেমন ওয়াকিবহাল নন। শ্যামাবিষয়ক গান সম্পর্কেও আমরা খুববেশি জানি না-কেবল রামপ্রসাদী গানের একটা চলন ও রূপরীতি আমাদের আয়ত্ত বলে মনে করি। কিন্তু অতদূর বর্তী কালে কেন, অনতিকাল

আগেও কলকাতার বহু জায়গায় কর্তা ভজাদের যে'ভাবের গীত' প্রচারিত ছিল তার বৈঠকি গায়নরীতি কি কেউ মনে রেখেছেন?বাংলা গানের আরেকটা দুর্বল দিক হল গ্রামীণ গান সম্পর্কে উদাসীনতা। আঠারো উনিশ শতকে নবগঠিত কলকাতার নব বাবু বিলাসের বিনোদনের কারণে যেসব গান রচিত হয়েছিল এবং তার যেসব বিশিষ্ট গীতিরীতি কল্পিত হয়েছিল তার সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালি খুব সচেতন ছিলেন কিন্তু আশ্চর্যরকম অচেতন ছিলেন সমসময়ের গ্রাম্যবাউল-মুর্শিদা -সহজিয়াদের গান সম্পর্কে। ভারী রাগতালের ব্রহ্মসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচার বিষয়ে ভদ্রশ্রেণির উদ্যমের অভাব ছিল না, তার কারণ নবজাগ্রত কলকাতা ও ঢাকার এলিট সমাজ ব্রহ্মোপসনার উপলক্ষে গানের সৃষ্টি ও তার গায়নসমাজের পোষকতা করতেন-বেতন দিয়ে ব্রহ্মসংগীত গায়কদের নিযুক্ত করতেন সমাজ এবং পরে বহু ব্রহ্ম সংগীতের স্বরলিপিও প্রণীত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়েছিল যাতে নিশ্চিত ভাবে গড়ে ওঠে এইজাতীয় গানের বিস্তারিত পরিধি। একথা ঠিক যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চার্চকেন্দ্রিক উপাসনার আদলে ব্রহ্মসংগীতের সূচনা। কিন্তু পরোক্ষে এই গান ঠাকুর বাড়ির নানামুখী সংগীত প্রতিভার স্পষ্ট বাংলা গানকে নতুন দিশা দেখায় পরবর্তী কালে। কিন্তু এত সব উদ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে মনে না এসেই পারে না যে, ১৮৯০ সালে প্রয়াত লালন শাহের গান সম্পর্কে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কেউই কিছু জানতেন না। তাই অমন সমৃদ্ধ বাণী ও সুরের সঞ্চয় থেকে বাঙালি শ্রোতা বরাবরই বঞ্চিতথেকে গেলেন। 'বীণাবাদিনী'পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী মাত্র দুটি লালনগীতির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। সভ্যসমাজে এখনও পর্যন্ত ওই দুটি গানই অবিতর্কিত ভাবে লালনগীতির মূল ধরনটির সাক্ষ্য দেয়। বলাবাহুল্য লালনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রধান স্থপতি রবীন্দ্রনাথ।

২

এতক্ষণ বাংলা গানের সম্পর্কে নানান রকম আলাপ চারীকরে আমি পাঠকদের সম্মুখীন করতে চাইছি একটি তত্ত্ব বা সত্যেরদিকে। সেটি এই যে, আমদের ভারতীয় মানস গানের কোনো স্থায়ী বা অনররূপে বিশ্বাসী নয়-কালে কালে নতুন নতুন গায়ক ও গায়ন গানের চেহারা সূক্ষ্মভাবে বদলে দিতে চায়। সেই জন্যই একশো-দুশো বছর আগেকার গানের আদলও এমনকী আমাদের আয়ত্তে থাকে না। ভারতীয় গান গুমুখী তথা ঘরানানির্ভর, তার ফলে একই গানের একাধিক আদলে আমরা খুব একটা বিচলিত হই না। প্রতীচ্যের গান তত্ত্বগতভাবে আমাদের গানের একেবারে বিপরীতধর্মী। সে গানরচনা ও সুর সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ীও অনড় রূপ পেয়ে যায, তার ওপর আর খোদকারি চলে না। সুরবিহারক করে তাতে নব নব বিভঙ্গ সৃষ্টির অবকাশ থাকে না পরবর্তী কালের শিল্পীদের কণ্ঠবাদনে। তা জন্ম মুহূর্তেই পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সতর্ক স্বরলিপিজালে আবদ্ধ। সেই জাল থেকে কোনো গায়কের মুক্তি নেই। চোখের সামনে সেই স্বরলিপি সেঁটে একেবারে কর্তর ইচ্ছায় কর্মের মতো গানটি গেয়ে যেতে হয়। আসলে শিল্পীর স্বাধীনতার চেয়ে পাশ্চাত্য গান অনেক বেশি তৎপর থাকে স্রষ্টার ইচ্ছাকে রূপায়ণ করতে। তবে কালে কালে, দেশে দেশে, এককজন গায়কের গায়নে কিকোনো ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না ? থাকে, তাকে বলা চলে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া, যা ধরা পড়েস্বরক্ষেপের কুশলী নিজস বতায়, কণ্ঠধ্বনির স্বাতন্ত্র্যে এবং ইনটারপ্রিটেশনে। তাতেই তোগানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। একই নজল গীতি ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র আরফিরোজা বেগমের গায়নে হালেচালে যেমন আলাদা হয়, ঠিক তেমনই।

এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কথাটা সাবলীল ভাবে এসে পড়ল। তার মানে সত্যিকারের ভালো গানেরনির্মাণে এমন একটা সামঞ্জস্য ও সুষমা থাকে যে শিল্পী সেইটা আবিষ্কার করেফেলেন এবং তার অন্তর্বার্তাটুকু বুঝিয়ে দেন গায়নকৌশলে। সুরের সেতু বেয়ে সেই গহন অন্তর্বার্তা পৌঁছে যায় দীক্ষিত ও মরমি শ্রোতার কান থেকে মর্মে। সব শিল্পী এই সেতু বাঁধতে পারেননা কিন্তু যিনি পারেন তিনি অনায়াসে পারেন। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা ' চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানের রূপায়ণে যখন'বিস্ময়ে' শব্দটি একাধিক রকমের স্বরক্ষেপণে 'ইনটারপ্রেট' করেছিলেন তাতে স্বরলিপি বজায় রেখেও একটা অন্য ব্যঞ্জনা জেগে উঠেছিল।এই গান কিন্তু আরকেউ অমন করে গাইতে পারেননি-হয়ত পারবেনও না। কেন এমন হয়? এক একটা গান কেন একেক জনের কণ্ঠ ও গায়নের সঙ্গে অবিস্মরণীয় মাধুর্যে জড়িয়ে যায়? সে কি গানেরই নিজস্ব কোনো অন্তর্গত গুণ। নাকি শিল্পীরই সেই নির্মাণ? এখানে সংগীত রসিকদের কথা একটু বলতে হবে। একজন রসজ্ঞ যেমন বলেছেন যে, প্রকৃত ভালো গানের মধ্যেই নাকি নিহিত আকাঙক্ষা থাকে, যোগ্য শিল্পীর কণ্ঠাশ্লেষ করে যা নিজেকে ছড়িয়ে মেলেদিতে চায় স্বতঃস্ফূর্ততায়। সেটাকেই বলা চলে সার্থক যুগলসম্মিলন, যাতে গীতমূর্তিরপূর্ণ উদ্ভাস। অর্থাৎ আততি থাকে দুপক্ষেরই। গান চায় যথার্থ দরদি শিল্পীরমধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আরশিল্পী চান গানের অন্তরাত্মাকে শ্রোতার সামনে সঠিকভাবে সুন্দর করে পৌঁছে দিতে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখা চাই যে আগেস্রষ্টা আর পরেশিল্পী।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনো শিল্পীর যদি মনে হয়,স্রষ্টার গানে আরেকটু কলাকৌশল, সামান্য অলংকরণ গানটিকে আরও প্রাণবন্ত এবং শ্রোতার পক্ষে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলবে, তাতে স্রষ্টা কী বলবেন? এ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল রাগ প্রধান বাংলা গানের যশস্বীশিল্পী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর জীবনে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাতগান 'অল্প লইয়া থাকি' গানটি তিনি সামান্য তান ও মীড়-মুড়কির খোঁচ দিয়ে গেয়ে রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। তাতে স্রষ্টার অনুমতি মেলেনি। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাঁধা যুক্তি ছিল এই যে, তাঁরগানে তিনি এমনকোনো ফাঁক রাখেননি যা অন্যের তান কর্তবে বা অলংকরণে ভরাট করতে হবে। প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর হয়তো বলার কথা ছিল এটাও যে, বাড়তি অলংকরণ করতে হলে নিজে গান বানিয়ে তাতে করাই তো সংগত। রচিত পদার্থের দায়িত্ব রচয়িতারই হাতে থাকা ভালো। স্রষ্টার এই যুক্তিও নিষেধাজ্ঞা জ্ঞান গোঁসাইয়ের পছন্দ হয়নি। অথচ গানটা ওইভাবে গাইবার ইচ্ছা ছিল তাঁর এত প্রবল যে অন্য কোনো উপায় না দেখে ওই গানের ধাঁচায় তিনি বাণী বয়ন করিয়ে নেন নজলকে দিয়ে। নজল ছিলেন অর্ডারি গানের দক্ষ কারিগর, কাজেই অচিরে অনায়াসে বেঁধে দিলেন সেই গান ঃ'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়'। জ্ঞান গোঁসাইয়ের অনন্য কণ্ঠের জাদুস্পর্শে, চমৎকার মীড়ের কাজে ওই গানের রেকর্ড সকলের মনোহরণ করল, বিপণনও হল সফল, কিন্তু তাই বলে'অল্প লইয়া থাকি' গানের অনুষঙ্গ কাটাতে পারল কি? বরংহয়ে উঠল আরেকটি গান।

গানের পুনর্নির্মাণের এই জেদ কিংবা বলাচলে স্রষ্টা ও রূপায়ণকারীর কর্তৃত্বের লড়াই কাগজে কলমে অনেকদূর এগিয়ে ছিল দিলীপ কুমার রায় আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পত্র বিনিময়ে। দিলীপকুমার ছিলেন নিজেই বড়োমাপের স্রষ্টা এবং আরও বড়োমাপের গায়ক, তাই তর্কবাগীশ তাঁর সত্তা হারমানতে চায়নি। তিনি চিঠি লিখে পিতৃপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন 'গায়ককে গানের সুর

করবার স্বাধীনতা দিতে হবে,' কারণ'ভারতীয় গানের ধারায় শিল্পী চিরকালকমবেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন। '

শুধুচিঠি লিখে বিতর্ক সৃষ্টি করে ক্ষান্তি দেবার মানুষ ছিলেন নাদিলীপকুমার। নিজে রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত হয়ে, হার্মোনিয়ম বাজিয়ে 'হে ক্ষণিকের অতিথি'গানটি নিজের প্রার্থিত অলংকরণে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বকর্ণে তাঁর নিজের গানের অমন রূপ শুনে ও বুঝে তারিফ করে শেষ পর্যন্ত যে মন্তব্য করেছিলেনতা অবিস্মরণীয়। মোটামুটিতাঁর বক্তব্য ছিল অনেকটা এইরকমঃ বেশ গাইলে তুমি। লাগলও বেশ ভালো। কিন্তু সবাই তো দিলীপ কুমার নয়, তাই আমি এ অনুমতি দিতে পারিনা। কিন্তু লক্ষ করা যায়এটাও যে তিনি তো পরম স্নেহাস্পদ দিলীপ কুমারকে ও অনুমতি দেননি ওই ভাবেগান প্রচারের। ক্ষোভেদুঃখে দিলীপকুমার ভবিষ্যতে আর কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের গান করেননি। তাঁর শেষদিন পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রসংগীতের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যেদিয়ে সেই গানকে একটা নতুন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তোলা যায়। অভিমান করে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ঃ'আপনি এতে করে বাজে শিল্পীর দ্বারা আপনার গানের নিবারণ করতে পারবেন না।'

দিলীপ কুমারের আশংকা অনুযায়ী বাজে শিল্পীর দ্বারা গানের ক্যারিকেচার, পরবর্তীকালে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে হয়েছিল কিনা সে -বৃত্তান্ত জানা দরকার। কিন্তু তার আগে জানতে হবে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপারটি ঠিক কী। তাঁর কুড়িবছর বয়সে লেখা'সংগীত ও ভাব', প্রবন্ধেএবং 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানের তত্ত্ব। তবু তাঁকে পরবর্তী ষাট বছরে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়ে ছিল নিজস্ব গানের টানে। যেন জীবন দেবতার মতোই অঙ্গুলি হেলনে সংগীতের প্রচ্ছন্ন পূর্ণ স্বরূপ তাঁকে কেবলই নিরীক্ষার নব নব পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথমে ছিল তার আত্মপ্রকাশের জন্য যথার্থ গানের বন্দিশটি খুঁজে নেওয়া সেই সঙ্গে আত্ম কণ্ঠটিকেও চিনে চিনে জীবনকে ভরিয়ে নেবার ব্রত। ঠাকুরবাড়ির বহুতর গানের চর্চার অব্যবহিত পরিধি, ব্রাহ্মসমাজের রাগভিত্তিক গানের চর্চা, জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরের নৃত্যচপল ছন্দ এবং নানাজনের কণ্ঠে শোনা নানা কিসিমের অমার্জিত লঘুবিষয়ের হাল্কা গান, বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সমসময়ের মঞ্চগীতি-সবই তাঁর গানের চেতনা ও চিন্তাক্ষেত্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। এত সব শ্রুতি-অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা বাংলাগানের একটি নবরূপের পথসন্ধান-বাণী ও সুরের সুষম অনুপাতে গড়েতোলা এক নতুন গানের ধরন, যার গায়ন পদ্ধতিও হবে অনুষ্কিত বিশেষ এক রকমের। তাঁর সময়কার চল্তি গানের অনুসরণ করায় তাঁর মর্জি ছিল না কারণ ওস্তাদি গানের অতিকৃতিতাঁর বহুভাবে শোনা ছিল। হিন্দুস্থানি গানের বানির অকিঞ্চিৎ করতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। বাংলা গানের উত্তমর্ণ যেকখনোই পশ্চিমা রাগদারী গান নয়, বরং বাংলার কীর্তনই তার দিশা একথা ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা ঘটেনি। ব্যক্তি হৃদয়ের উৎসারণ ঘটাবার জন্য লিরিকাল গানের পাশাপাশি তিনি আত্মনিরপেক্ষ নাট্যগান রচনা করেও বুঝে নিয়েছিলেন বাংলা গানের বহন ক্ষমতা। পরে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবনে নানা পার্বণ,অনুষ্ঠান আর নিসর্গরঙ্গতাঁকে এবং তাঁর গানকে ভরিয়ে দিয়েছে বিচিত্রতর সৃষ্টিরজ্যোতিরূৎসবে। মাঝখানে স্বদেশিয়ানারঝোঁকে উদ্দীপ্ত গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রাম বাংলারলৌকিক সুরকাঠামোর মৌলিক সারল্য তিনি অনুভব করেন। বাউল গানের

তালও লয় তাঁর গানকে বরাবার স্পর্শ করে যায়,। বিলেতফেরত রবীন্দ্রনাথ বিলিতি গানের উচ্চাবচ চলনে গান বেঁধে সংগীতের মুক্তির কথাই ভেবেছিলেন প্রথম যৌবনে।

রবীন্দ্রনাথেরছিল এক স্পষ্ট সংগীত-চিন্তা এবং গানে ও গায়নের স্বতেন্ত্র্য সেই চিন্তাকে রূপ দিয়ে গেছেন। সমসময়ের তিনটি প্রতিকূলতা তাঁকে পেরোতে হয়েছিল। প্রথমে অমার্জিত চিহীন হালকা গানের বাণী ও সুর থেকে তিনি বাঙালিকে বাঁচালেন তাঁদের জন্য চিপূর্ণশিষ্ট গান লিখে। তার পরেনাট্য গানকে অন্যদের মতো উল্লাসিক ভঙ্গিতে সরিয়ে না রেখে মঞ্চাশ্রয়েই গড়েনিলেন বিচিত্র গানের নবীন জগৎ। সবশেষেতিনি ওস্তাদদের গানের নামে তানবাজি আর কালোয়াতি বর্জন করে এমনগানের গড়ন তৈরি করলেন যাতে কথা ও সুরের সমান আসন-কেউকাউকে ছাপিয়ে যায় না। বাংলা গানকে তার নিজস্ব চারিত্র্যে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর এইপ্রয়াস খুব সহজে ঘটেনি। নানা প্রতিবন্ধ পেরিয়ে, নানা সমালোচনার জবাব দিয়ে, নিজে গেয়ে, নিবন্ধ লিখে,তর্ক করে এবং শেষপর্যন্ত নিজের গানের পক্ষে উপযুক্ত ও যথার্থগায়নবৃত্ত তৈরি করে তবে সফল হয়েছেন। আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে শ্রোতৃ সমাজও।

‘প্রাণহীনও দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার’ বলে যদিও নিজের দেশের হীন অবস্থাকেসে সময়ে শনাক্ত করতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়নি এবং গানহীনতার বেদনা থেকে দেশ ওসংস্কৃতিকে মুক্ত করে তাঁর প্রয়াস যদিও একাগ্র ছিল গানের আধুনিকতার সন্ধানে, তবু তখনও তিনি জানেননি যে তাঁর গানের চাবি দিয়েই ভবিষ্যতে খোলা হবে বাংলা গানের দ্ধগৃহ-তাতে বয়ে যাবে বহুজনের সংযোগে সৃষ্টির সুবাতাস। রবীন্দ্রনাথের গানরচনার ইতিহাস যাঁরা বিশেষভাবে করেছেন তাঁরা কবুল করেছেন যে সেইগানের অগ্রস্মৃতি হল রবিবাবুর গানের রবীন্দ্রসংগীত হয়ে ওঠার গভীর নির্জন পথে। তাঁর গান নিঃসন্দেহে নির্জন এককের গান,যদিও তিনি একলব্য নন। গানের ক্ষেত্রে, অন্তত নিজত্বের সামর্থ্যে এবং গায়নের স্বমহিমায় তাঁর কোনো পূর্বাচার্য ছিল না। ঠাকুর বাড়ির সুদর্শন এক যুবা সুললিত কণ্ঠে যখন সভাসমিতির শেষে বা ঘরোয়া জমায়েতে নিজের গান গাইতেন শ্রোতাদের অনুরোধে, তখন তার পরিচয় দেওয়া হতরবিবাবুর গান বলে। ঈষৎ পরবর্তীকালে কলকাতার নটি বা অশিক্ষিত পেশাদার গায়িকারা যখন অদ্ভুত সুরে ওচটুল চালে রবিবাবুর গান রেকর্ডে গেয়েছিলেন তখন তাঁরা বা তাঁদের ট্রেনাররা জানতেও পারেননি ঐতিহাসিকভাবে কত বড় এক মহান শিল্পের কীকণ সূচনা তাঁরা করে যাচ্ছেন। কোনো বিবেচনাতেই রেকর্ডধৃত ওই সব গান সম্পর্কে ‘বাজে শিল্পীর দ্বারা গানের ক্যারিকেচার’ বলা সংগত নয়, কেননা সে গানের মূল চেহারাটাই তো তাঁদের কাছে ছিল অজানা। এমনই অজ্ঞতাবশত ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’ এবং আরও কটি রবীন্দ্র রচিত গান বটতলা প্রকাশিত ‘বেশ্যা সংগীত’সংকলনে এসে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথেরগান রচনার জীবন-পথ তাই প্রথম থেকেই উপলব্যথিত এবং সারাজীবন ধরে নিজের গানকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড় করানোর কাজেক ঠিন অধ্যবসায় ও মনের সমতার পরিচয় তাঁকে রাখতে হয়েছে। সেকালের প্রচলিত ধারার বাংলা গানের পক্ষে দলছুট তাঁর বিশিষ্ট ধরনের গান গাইবার জন্য যে সংযত কণ্ঠকৌশল, পেলবতা ও দরদ প্রয়োজন ছিল, ছিল মননের দীক্ষা ও চিমান মনের শান্ত শুশ্রুষা, সমসাময়িক সমাজ পরিবেশে তা কজনই বা সে সময়ে অর্জন করতে পারতেন ?

প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে তাই নির্ভর করতে হয়েছিল পরিবার বৃত্তের মধ্যে স্নেহভাজন অভিজ্ঞা -প্রতিভা-ইন্দিরা-সরলার গায়নের উপর। কিছু পরে তাঁর গানের যথার্থ ভাণ্ডারীহয়ে ওঠেন সংগীত প্রাণ দিনু ঠাকুর, কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে। তাঁর ওপরেই এসে পড়ে রবীন্দ্রগীতির সম্প্রচার, শিক্ষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বা কর্তব্য। তারই টানে তিনি স্বরলিপি প্রণয়নেমন দেন এবং কীভাবে গাইতে হয় এসব বিশিষ্ট ধরনের গান সেটা বুঝিয়ে,গান গেয়ে, তৈরি করে নেন বেশ কজন আশ্রমিক ছেলেমেয়েকে। তাঁরাই ত্র মেওই গানের ও গায়নের বৃত্তকে আরও বড়ো করে তোলেন। বিনোদনের গড়পড়তা চাহিদা মেটানোরপরেও রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের কাছে হয়ে পড়ে অত্যাগসহন সম্পদ, জীবন -স্বপ্নের পাথেয়, আত্মবিকাশের দিশা এবং বলাবাহুল্য এই সব কিছুর পেছনেই ছিল স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ও উৎসাহ, উৎকণ্ঠা ও আততি,নির্দেশ ও অনুশাসন। ত্র মে গানের ভাণ্ডারী দিনুহয়ে ওঠেন শান্তিনিকেতনের সকল নাটের কাণ্ডারী ফলে স্রষ্টার গানের রাজরথ ঢুকে পড়ে নাট্যমঞ্চে- গানে আসে আরও নানা সম্ভাবনা ও গায়নের বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথের কুড়ি থেকে আশি বছর বয়সব্যাপী গান রচনার প্রকৃত বৃত্তান্ত নানাবাঁকে ও বহুরকম ব্যক্তি সমবায়ে গ্রথিত- এমনটি বাংলার সংগীত কারদের কারোর জীবনে ঘটেনি। পরিবার বৃত্ত থেকে রসদ নিয়ে নিজের গীতিসত্তা গড়ে তোলা ব্যক্তিত্বের সংহত ধ্যানে এবং তারপরে সেই ব্যক্তি সত্তার উজ্জীবন ও বিকাশ ঘটানো আশ্রমের নানা ব্যক্তির সহযোগে ও উৎসবে-অনুষ্ঠানে-উদ্দীপনে, এ একেবারে অভিনব সংঘটন। কেবল নিজের ভাবনার গান রচনা করেই সেই উদ্যমের ক্ষান্তি ঘটেনি, নানা উপলক্ষকে বা আশ্রমিক জীবনের ছোটখাটো ঘটনাকে ঘিরে স্বতই উচ্ছ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। কেউ কেউ আবদার ও বিনতি জানিয়ে তাঁকে দিয়ে অনেক গান লিখিয়েছেন, নাচের নব ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে দতাঁকে কতবার ঘটাতে হয়েছে নতুন গানের প্রস্তাবনা। এইভাবে গান সৃষ্টির আবেগ রবীন্দ্রনাথেরক্ষেত্রে একক ভাবনা থেকে সামূহিক ভাবনাতেও ব্যাপ্ত হয়েছে। তার কিছু উদাহরণ আমরা জানতে পারি সেকালে বিশ্বভারতীর আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণে। শ্যামা-চণ্ডালিকা-চিত্রাঙ্গদা বর্গের নৃত্যনাট্য যখন গু দেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে মঞ্চস্থ হতখোদশান্তিনিকেতনে, তখন হয়তো শ্যামার গান গাইত বেশ কজন মেয়ে। অর্জুনের গান গাইত বেশ কজন ছেলে। রবীন্দ্রনাথ আসলে চাইতেন তাঁর গানের আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। আর্টের শর্তনিয়ে তত মাথাব্যথা ছিল না তাঁর,তিনি চাইতেন সংযোগ। 'পারবিকি তুই যোগ দিতে এই ছন্দে রে' আহ্বান ছিল তাঁর এই টাই। তার কারণ তিনি বুঝতেপেরেছিলেন, যে বিশিষ্ট ধরনের বাংলা গান তিনি রেখে যাচ্ছেন তাঁর সংগত ও যথার্থ উত্তরাধিকার হিসাবে,তার প্রচার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথগায়নের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত রস ফোটানোর দায়িত্ব নিতে হবে তাঁর পরিমণ্ডলের অনুরাগীদের। সেই জন্যই সংগীত ভবনের প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনা তাঁর সব যে আনন্দের ও নন্দনের থেকে সূচনা ঘটবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার শুদ্ধ ও সাবলীল পরিবেশের। আশ্রমের সব রকমের স্তরের পাঠক্রমের বীন্দ্রসংগীতের অন্তর্ভূক্তি প্রমাণ করে তাঁর শিক্ষা চিন্তার নিজস্বতা। সেইআনন্দযজ্ঞে পাঠ গ্রহণ তাই আর থাকে না পরীক্ষা পাশের যান্ত্রিকতায় একঘেয়ে, তার মধ্যে গান ও নাচের মুক্তি এসে অবাধ প্রকৃতিময়তার মধ্যে শিক্ষার্থীর মনের বিকাশ ও প্রসার ঘটায়। এবারে সম্ভবত স্পষ্ট হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। শিক্ষক-শিক্ষাসত্র-শিক্ষণ-শিক্ষার্থীএই চতুরঙ্গ সমন্বয়ে শান্তিনিকেতনের সংগীত ভবন জমজমাট হয়ে উঠল। সেখান থেকে গুরুদেবের গানের দীক্ষা নিয়ে যেসব মানুষ ছড়িয়ে পড়লেন অখণ্ড বাংলায় এবং সারা ভারতে, তাঁরা নিজ নিজ জনপদে

গড়ে তুললেন গুরুদেবের গানের পরিমণ্ডল, প্রচার করতে লাগলেন সেই গানের গায়নের শুদ্ধ ও সংযত মহিমা। শিক্ষকদের সতর্ক প্রহরায় ও তত্ত্বধানে স্বরলিপি পাঠে তাঁরা দক্ষ হয়ে উঠলেন।রবীন্দ্রসংগীতের শান্তিনিকেতনি ঘরানাবলে একটি লোক প্রসিদ্ধি সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রবহমান। এমনতর প্রসিদ্ধি অর্জনে সময় ও সাফল্যেরযোগ থাকা স্বাভাবিক এবং সেইসঙ্গে ধারাবাহিকতার। প্রবাদপ্রতিম গুরুকুল এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নে যে - মিথ তৈরি করেছিল এক সময়ে, তার রেশ এখনও আছে। শান্তিনিকেতনের পুরনো কালের এমনই এক ছাত্র সুধীর চন্দ গত ৪৪ বছর ধরে দিল্লিতে বসবাস করলেও রবীন্দ্রগীতির প্রচার ও শিক্ষণে মশগুল হয়ে আছেন, সেসম্পর্কে প্রনিধানযোগ্য বইও লিখেছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর সুধীর চন্দ-রশান্তিনিকেতনের শিক্ষা পর্ব কেটেছে, তবু তখনও কতটা সমৃদ্ধ ছিল আশ্রমের গানের আনন্দময় পরিবেশতার বর্ণনা পাই তাঁর স্মৃতিকথায়(সাত ঘাটের জল')। একজায়গায় লিখছেনঃ বৈতালিকেব একটি দল তৈরি হয়েছিল। সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার রোজ এক একটি নতুন গান শেখাতেন ... ভ্রাম্যমাণ গানের দলের বর্ণনা এইরকমঃ শৈলজাদার হাতে অবিচ্ছেদ্য খঞ্জনিটি, বীরেনদা, বিশালাকায় এস্রাজ কোমরে বেঁধে বিনায় কমাসোজি, বেহালা কাঁধেচৈতীদা, খোল নিয়ে শ্যামদা, আমরা সব দল বেঁধে গাইতে গাইতে চলেছি,'ধবনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাতঅম্বর মাঝে'। তখন একটা কীউৎসাহের জোয়ার। যেন এক অত্যাশর্চ্য নতুন দেশ আবিষ্কার করেছি, সবপেয়েছির দেশ। এইসব পাওয়া এত বড়ো মাত্রায় যে সুধীর চন্দ সারাজীবনের আনন্দের ও সন্ধানের রসদ পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের গানে। নিজেকে তাঁর মন হয়েছে'ওখানকার মাটি-জল দিয়ে শান্তিনিকেতন-কুমোরের হাতে গড়া জিনিস।'এতক্ষণেবোধহয় স্পষ্ট হল আমাদের যে, রবীন্দ্রসংগীত ঠিক কী বস্তু এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি আর স্বাতন্ত্র্য কতটা গভীর। এ সম্পর্কে পুঁথির পাতা আর না বাড়িয়ে এবারে উদ্ধৃত করব একজন বিদেশি সংগীতরসিক ও গায়ক আর্নল্ড বাকে-রমন্তব্য, শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবের জীবৎকালে যিনি রবীন্দ্রসংগীতে নিষ্ণাত হয়েছিলেন এবং স্বরলিপিসহ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ২৬টি গান।তাঁর মতে ঃ

He was the first composer in India to regard his songs as indivisible entities, into which other Singers should not introduce their own variations as they habitually do when singing any body's Songs. He is undoubtedly the first Indian composer who felt his compositions were finished pieces of work, where ornaments were admissible only where he himself had intended them to be. A change in the melody, a change in rhythm and on extra trill or run here and there only could detract from the original meaning.

As he felt strongly that his melody expressed the hidden sense of his words, a change from what he had composed meant, without fail a falsification of his intention.

৩

কিন্তু সমস্যা এই যে, সমাজ ও সংস্কৃতি তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তার পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রসংগীত ও তার স্রষ্টা যতদিন শান্তিনিকেতন বাসী ততদিন সংকট দেখা দেয়নি। উৎসুক ছাত্রছাত্রী এবং আশ্রমবাসীদের মধ্যেকারোর কারোর সন্তানরা গান শিখতেন প্রথমে দিনু ঠাকুর,তারপরে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, ভীমরাও শাস্ত্রী, বীরেন পালিত, শৈলজারঞ্জন,অনাদিকুমার দস্তিদার, সুধীর কুমার কর,

রমা মজুমদার ও শান্তিদেবঘোষের কাছে। এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিও করে গেছেন। বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সম্বৃত পরিবেশ ও তার শুদ্ধ পরিবেশনের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। রবীনদ্রনাথ সে সময়ে মানানসই ভঙ্গিতে লিখতে পেরেছিলেনঃ 'রচনা যে করে, রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই' এবং 'যার যেটি কীর্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগতার একলারই'। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও।'

কিন্তু কবিতা আর ছবির সঙ্গে কানের তুলনা তেমন টেঁকসই নয়, কারণ গান হলপারফরমিং আর্ট-তাই তার রূপায়ণে ও প্রচারে গায়ক-গায়িকার সহযোগ লাগে এবং সমস্যার সূচনা বিন্দু এইখানে। স্রষ্টার রচিত পদার্থ গীতশিল্পী কীভাবে পরিবেশন করবেন, তার বিবেচনায়, শ্রোতাদের কথাও এসে যাওয়া স্বাভাবিক। বহুদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান ছিল হয় ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার নয়শান্তিনিকেতনি কাণ্ড। তার গায়ক গায়িকা , গায়ন ও শ্রোতাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি যোগাযোগের সূত্রছিল, ছিল স্রষ্টার প্রতি নির্দ্বিধ আনুগত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ। অমন একজন হিরণ্ময় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর খ্যাতির বলয় সকলকে করে রেখেছিল বশীভূত ও প্রশ্নহীন। 'যে-ব্যক্তি গানরচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা' তাই খুব কিছু কঠিন হয়নি—অন্ততবেশ কিছুকাল।

প্রথম সংকট দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যবয়সে,১৯৩৭ সালে, যখন কলকাতার সবাকচলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। হয়তো তাঁর স্বায়ত্ত গণ্ডীর বাইরে নিজের গানকে স্রষ্টা একটু ব্যাপকতায় দেখতে চেয়েছিলেন জীবন সায়াহ্নে -দেখতে চেয়েছিলেন আপন গানের আত্ম নিরপেক্ষ রূপ।চেয়েছিলেন অদীক্ষিত শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে। কারণ যাইহোক প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিতে সংগীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিককে তিনি অনুমতি দিলেন রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের। পঙ্কজকুমার ও কাননবালার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সাধারণদর্শক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণি একই সঙ্গে আবেগ তাড়িত হয়ে পড়লেন। এই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত হল ব্যাপক অর্থে জনপ্রিয় এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে 'মুক্তি' ছবির গান বাঙালির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেল। মুক্তি নামটি ভারীদ্যোতক হয়ে উঠল, কারণ সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে তাঁর গানের মুক্তি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল - সব স্রষ্টারই তাথাকে। পঙ্কজ মল্লিক সুযোগ পেয়ে আরেক কাণ্ড করে বসলেন। 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতায় সুরদিয়ে সেটিও ছবিতে ভরে দিলেন নিজে গেয়ে এবং তা হয়ে গেল চিরকালের জন্যসফল ও সুন্দর এক গান। তাহলে কবিতা হিসাবে 'রচিত পদার্থ' এবার অন্যের করা সুরের অলংকার পরে গান পদবাচ্য হয়ে গেল। 'মুক্তি'-রপরেই সাহস পেয়ে রাইচাঁদ বড়াল 'পরিচয়' ও 'জীবনমরণ' ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইয়ে দিলেন পঞ্চাবতনয় সাইগলকে দিয়ে। সে গানও জনাদরে ভেসে গেল।

এতেকি ভালো হলো? জানি না, কিন্তু কিছুসংশয়ী রবীন্দ্রানুরাগীদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে গড় বাঙালি শ্রোতাদেরসামনে এক নতুন রসের উৎস খুলে গেল। সেইসঙ্গে ভেঙে গেল আরেকটা সংস্কারের অচলায়তন যে অদীক্ষিত(অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের দীক্ষায়) গায়কগায়িকার গায়নেতাহলে রবীন্দ্রসংগীতের রসাবেদন সৃষ্টির খুব একটা হানি ঘটে না। পঙ্কজ-সায়গল-কানন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন বড়োমাপের পারফরমার, তাই তাঁদের একটু আধটু ঘরানাগত বিচ্যুতি বা উচ্চারণঘটিত দোষ কেউ বিচারের মধ্যেই আনেননি। আর একথা তো আজ সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে সেই প্রমথেশ

বড়ুয়া থেকে শুরু করে তপন সিংহ-ঋত্বিক সত্যজিৎ হয়ে আজকের অপর্ণা-ঋতুপর্ণ-গৌতম পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথের গানের নানা সূক্ষ্ম ওদ্যোতনাময় ব্যবহার বা প্রয়োগ চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধতর করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ১৯৩৭ সালে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন বলতে হবে।

কিন্তু শুধু তো চলচ্চিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের গান ক্রমেই অধিকার করে নিল বেতার মঞ্চ ওরেকর্ডের জগৎ। তাঁর রচিত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি কলকাতা ও বাংলার মঞ্চে রূপায়িত হতে থাকল। বাঙালির রসচিও সংগীত-সংস্কৃতির গঠনে রবীন্দ্রসংগীত ধীরে ধীরে হয়ে উঠল অবিচ্ছেদ্য সম্পদ, অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার ও প্রতিদিনের যাপনগত অভ্যাস। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রপ্রয়াণ ঘটে এবং ঠিক তার পরের বছর কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাকেন্দ্র'গীতবিতান'-এর সূচনা। তারপরে খুব নিশ্চিত পদক্ষেপে ১৯৬১ সালে তাঁর শতবর্ষের কুড়ি বছরের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে গেল সবখানে। দুই বাংলায়, বহির্বঙ্গে, এমনকী বহির্ভারতে। তারফলে এই গান সম্ভাবিত করে তুলল বিপণনের নতুন ইঙ্গিত। রবীন্দ্রসংগীতের বাণিজ্যিক সফলতা বিশ্বভারতী ও দেশের নানাস্তরের শিল্পীদের এনে দিল অর্থ যশ সচ্ছলতা। 'স্বরবিতান'-এর খণ্ড গুলি পেয়ে গেল বেস্ট সেলারের শিরোপা। রবীন্দ্রসংগীত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল।

এবারে আঁটাআঁটি শুরু হল প্রধানত বিশ্বভারতীর তরফে। কপিরাইট আইনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে বিশ্বভারতী নিউজিক বোর্ড নানা অনুজ্ঞা ও অনুশাসন জারি করলেন।স্বরলিপি অনুসরণের কঠোর নির্দেশ, সংগীতানুষঙ্গ নিয়ে মতান্তর এবং নানা কূটকচালিতে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াযেন এক শংকা ও ভীতির বিষয় হয়ে উঠল কোনোকোনো শিল্পীরপক্ষে। সাবধানী পথিকের দল স্বরলিপি শাসিত ঊষর পথে কৃত্রিম গায়নে ছাড়পত্র পেতে লাগলেন। অনেক শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রগীতিরেকর্ড বা ক্যাসেট মিউজিক বোর্ডের অনুমোদন না পেয়ে প্রকাশের মুখদেখতে পেল না। অভিমানে দেবব্রত বিশ্বাসের মতো জনাদৃত শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের পরিসরে নিজেকে ব্রাত্য বলে ঘোষণাকরে প্রায় 'ওরা আমাদের গাইতে দেয় না' গোছের গান গাইতে লাগলেন মঞ্চে। তাঁর পরিচয় দাঁড়াল 'বিতর্কিত শিল্পি' বলে। সভানুষ্ঠানে তিনি প্রকাশ্যে গাইতে শুরু করলেন পরিমল হোমের সুর করা রবীন্দ্রবাণী। সে সব গান দেবব্রত-র স্বর্ণকণ্ঠ ও খোলামেলা গায়নে সভানুষ্ঠানের পরিসরে জমে উঠলেও বাণিজ্যের বাজারে বিকাল না। অর্থাৎরবীন্দ্রসংগীতের কোনো বিকল্পনেই সেটা স্পষ্ট হল। কিন্তু এরমধ্যে খোদ সংগীত সমিতির অনুমোদনেকি অন্যতর অনাসৃষ্টি হয়নি ? সংগীতজ্ঞজন বিশ্লেষণ করে দেখালেন 'তবু মনেরেখো' গানটি শৈলজারঞ্জনের তত্ত্বাবধানে কণিকা, সুচিত্রা ও নীলিমা তিনভাবে গেয়ে রেকর্ড করেছেন এবং সব কটি রেকর্ডই অনুমোদন পেয়ে গেছে। অনেক ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালেন খোদ 'স্বরবিতান'ই দ্বিচারিতায় ভরা। বহু গানের স্বরলিপি যা আগের স্বরবিতান'-এ ছিল তা সাম্প্রতিক সংস্করণের 'স্বরবিতান' থেকে কে বা কারা অদৃশ্য করে দিয়েছেন। সন্তোষ সেনগুপ্তের মতো রবীন্দ্রপ্রেমিকের পরিচালনায় গ্রামোফোন কোম্পানি যে 'চিত্রাঙ্গদা' বার করলেন, সেই রেকর্ডে কোনঅজ্ঞাত কারণে কুরূপা ও সুরূপা চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠ ঠাঁই বদল করে নিলসুচিত্রা ওকণিকার মধ্যে। এমন অযৌক্তিক প্রযোজনা কেমন করে সংগীত সমিতির মেধাবী সদস্যদের অনুমোদন পেল? সুরূপা ও কুরূপা চিত্রাঙ্গদার পার্থক্য তো কেবল বর্ষকালীন দেহগত বহিরঙ্গের, তাই বলে তার কণ্ঠস্বরও কি পালটে যাবে? এর পিছনে তবে কি কোনো বাণিজ্যিক অভিসন্ধি ছিল?

ভেতরে ভেতরে একধরনের গুমোট তৈরি হচ্ছিল, বেশ খানিকটা চাপা ক্ষোভও। রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নে খোলামেলা ভাবটা যেন আর থাকছিলনা। চারিদিকে 'বাজে গুর গুরু শংঙ্কার ডংকা'অবস্থা। শুদ্ধতাবাদীদের অনুজ্ঞা প্রচ্ছন্ন ভাবে সারা দেশের রবীন্দ্রসংগীতের পরিমণ্ডলে অনুভব করা যেতে লাগল। অথচ তারহ মধ্যে সংগীত সমিতির অনুমোদনে আশা ভোঁসলের গাওয়া রবীন্দ্রগীতির রেকর্ড বেশ বাণিজ্য করল ভুল উচ্চারণে কন্টকিত হয়েও- যদিও দেবব্রতরগান ছাড়পত্র পেলনা বিশ্বভারতীর। তবে একটি সত্য ইত্যবসরে স্পষ্ট হয়ে গেল। শুদ্ধভাবে স্বরলিপি মেনে যথাযথ ভঙ্গিতে বাণী ওসুরের সযমতা বজায় রেখে সেসব শিল্পীরেকর্ডে, রেডিওতে বাসভানুষ্ঠানে গাইতে লাগলেন তাঁদের সমাদর করবার মতো শ্রোতা বা ত্রে তাত্র মশ বাড়তে লাগল। সুবিনয় রায়,অশোকত , সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ঋতুগুহ, অর্ঘ্য সেন, সাগর সেন, সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, চিত্রলেখা চৌধুরী, নীলিমা সেন, এনাক্ষী-সংঘমিত্রাদের গান শোনার জন্য গানের আসরে স্রোতার সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। যদিও একদল শ্রোতা কিংবা খবরের কাগজের কলমচিরা কেবলই লেখালেখি করে জানান দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের মুক্তি আসন্ন, কেননা কপিরাইট আইনের শক্ত বাঁধন কেটে যাবে ১৯৯১ সালের পরে। কিন্তু বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ নজিরবিহীন ভাবে স্বত্বাধিকার আইনকে আরও দশ বছর পেছিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়। বাণিজ্যগত রেকর্ডসংস্থা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, বহুতরগজিয়ে ওঠা ক্যাসেট কোম্পানি নানা ছাঁদের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রগীতির বেসাতি করতে লাগল। আমরাসবিস্ম্সন্দ্বয়ে দেখলাম কিশোরকুমার, কুমার শানু, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, ঊষা উত্থুপ, বর্গের অনেক অদীক্ষিত গায়ক গায়িকাদের গান ও ক্যাসেটসংগীত সমিতির অনুমোদন পেয়ে গেল। কিন্তু অনেক বঙ্গবাসী শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত তাঁদের খুশি করতে পারলনা। বিশ্বভারতীর এতে কোনো হেলদোল ঘটেনি, কারণ তাঁরা কপিরাইটের সীমা বাড়াতে চেয়ে ছিলেন যাতে রবীন্দ্রসাহিত্য বিক্রয় করে তাঁদের আয়ের উৎস আগের মতো স্ফীত থাকে। সব রকম রবীন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁদের খবরদারি, অনুশাসন ও কর্তৃত্বতাঁরা একচেটিয়া ভাবে ভোগ করবেন এটাই তো প্রার্থিত। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথেরবইয়ের দাম যে বাজার-ছাড়া ছিল সে তো সবাই মানবেন। সাধারণ পাঠকদের জন্য তার সুলভ সংস্করণ পাওয়া ছিল প্রশ্নাতীত। এসময়েকোনো বিখ্যাত শিল্পীকে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে বললেই তিনি বলতেন, 'ওরেবাবা- দরকার নেই। কোথায় কী ভুলহয়ে যাবে। আটকে দেবে। খুঁত ধরবে। আমি বরং অন্যের গান শোনাচ্ছি।'

এইভাবেই চলতে চলতে গড়াতে গড়াতে রবীন্দ্রনাথের গানের জয়রথ এগোতে লাগল দীক্ষিত শ্রোতাদের আনুকূল্যে। ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীকান্ত আচার্য ও ইন্দ্রাণী সেনদের মতো সুকণ্ঠ ওমঞ্চনিষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের অন্যান্য গান পরিবেশনের সমান্তরালে রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেটেও বেশ বাণিজ্য সফল হলেন। এবারে এক ধরনের নতুন বর্গের শিল্পী পেলাম আমরা, এইশিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত গত প্রাণ নন। কিন্তু প্রচণ্ড প্রফেশনাল, তাই গায়নের ও স্বরক্ষেপণের নিষ্ঠা তাঁদের বিশেষল ক্ষণীয়। সুবিনয় শান্তিদেব, অশোকত , গীতা ঘটক, কণিকা, নীলিমা সেনদের মতো শুধু রবীন্দ্রগীতি সমর্থ শিল্পীদের দিনকি তবে ফুরিয়ে এল ? ইন্দ্রাণী তো সাবলীলভাবে রবীন্দ্রনাথ আর নজ লেরগান গাইতে লাগলেন। ইন্দ্রনীল ও শ্রীকান্ত একই সঙ্গে আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীতে বাজার মাত্ করে দিলেন-টেলিভিশনের সিরিয়ালের শীর্ষ-গানেও তাঁরা সমান দক্ষ দেখা গেল। এইখানে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কথা এসে যাবে। নব্বইয়ের

দশকে তাঁর নতুন ধরনের বাংলা গাননিয়ে আকস্মিক উত্থান, মঞ্চ ব্যবহারের ও যন্ত্রবাদ্যের কুশলী প্রয়োগ এবং সেইসঙ্গে বাক্‌চাতুর্যে মঞ্চ থেকে শ্রোতাদের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলা -এতদিনকার বাঙালি শ্রোতা-শিল্পী সম্পর্কের মধ্যে একটা অদৃষ্টপূর্ব নতুনসেতু গড়ে তুলল। সুমন কখনও খোলা মঞ্চে জলসা করতেন না। তাঁর কৌশল ছিল চারদিক আঁটা অডিটোরিয়ামে ধবনি ব্যবস্থার যথাযথ সদ্ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সাহায্য তুখোড় কণ্ঠবাদন। দেশি বিদেশি দু'রকম গানেই তাঁর অধিকার ছিল এবং সেইরকম গানের পরিবেশনের ফাঁকে একটা দুটো রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে দিতেন আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গের সুমিত প্রয়োগে। এইসূত্রে বাঙালি শ্রোতা,বিশেষত নবীন বয়সিরা, পেয়ে গেলেন রবীন্দ্রসংগীতের একনতুন ধরনের গায়ন। লক্ষকরার বিষয় ছিল এইটাই যে, বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির খবরদারি রেকর্ডেরক্ষেত্রে থাকলেও সভা সমিতিতে কিংবা অডিটোরিয়ামে রবীন্দ্রনাথের গানের রূপায়ণে তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। লক্ষ করবার বিষয় এটাও যে'সুমনের গান' বিষয়টি যতটা আলোড়ল তুলল এবং বিপণন সাফল্য পেল (বারে বারে গোল্ডেন জিস্ক) তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের ক্যাসেটতেমন সমাদর বা স্বীকৃতি পায়নি। তবেকি ততদিনে শ্রোতাদের মধ্যে এসে গেছে এক রকম শুচিতাবোধ বা শুদ্ধতাবাদেরনেশা?অনেকেই আশংঙ্কা প্রকাশ করতে লাগলেন রবীন্দ্রসংগীতের সুদিন এবারবোধহয় অস্তমান। রবীন্দ্রগীতির নানা আসরে শ্রোতাদের আসন ফাঁকা হতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

এইসময়ে একেবারে হঠাৎ মঞ্চ অধিকার করে রবীন্দ্রনাথের গানের এক নতুনবোধভাষ্য তৈরি করে এসে গেলেন পীযুষকান্তি সরকার। তাঁর চেহারা, পোষাক, মননক্রিয়া, উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ এবং সংগীতানুশীলনের ঐতিহ্য সকলকে চমকিত করে দিল। ১৯৯৩ সাল থেকে তাঁর রেকর্ড করা রবীন্দ্রসংগীত আটকে ছিল বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির দপ্তরে, ১৯৯৫ সালে তা প্রকাশের ছাড়পত্র পায়। কিন্তু প্রকাশিত ক্যাসেটে ছিল মাত্র ৪ খানি গান। মাত্র ৪ খানি কেন ? পীযুষকান্তি সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন, 'হ্যাঁ, ক্যাসেটে চারটে মাত্র গান, এটা হয় না। কিন্তু আরো আটটা গান মিউজিক বোর্ড আটকে দিয়েছে। এখনও আটকে আছে। রিলিজ হয়নি'। এই আটকে যাওয়ার কারণও শিল্পীকে জানানো হয়েছে ঃ 'আর্টিকুলেশন' ঠিকহয়নি। তারমানে, সোজা বাংলায় তাঁর গায়নবা সুর নয়, আপত্তি ছিল উচ্চারণে। পীযূষকান্তির আবির্ভাব তাঁর ৫৮ বছর বয়সে এবং এসেই আলোড়ন তুলে দেন দর্শকদের মধ্যে। হ্যাঁ, সচেতন ভাবে শ্রোতা না বলে দর্শক বলছি, কারণ পীযুষের রবীন্দ্রসংগীত গায়ন যতটা শ্রভ্য তার চেয়ে বেশি দর্শনীয়। তাতে বিচিত্র অঙ্গবিক্ষেপ, হাতের মুদ্রা, তাঁর পরিকল্পিত পোষাক এবং ঠোঁটের গোড়ায় সংলগ্ন ছোটমাইক সবই রবীন্দ্রসংগীতের এতদিনের আসরে কখনও দেখেননি কেউ। ব্যাপার সম্পর্কে শিল্পী যে বেশ সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাচ্ছি তাঁর জবানি।

প্রশ্নঃ আপনার 'কেশদাম' এবং'শ্মশ্রু'- এটাও রবীন্দ্র প্রভাবিত ?

উত্তরঃ (হাসতে হাসতে) তো অনেকে বলে মার্কেটিংয়ের জন্যে। তবে এটা স্বাভাবিক ভাবেই গজিয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ তবে বেশ মাপ মতো রেখেছেন চুলআর দাড়ি - রবীন্দ্র রবীন্দ্র ভাব আছে।

উত্তরঃ তুমি যদি দুষ্টুমি করে বলো তাহলে তাই।

প্রশ্নঃ আপনার পোশাক? একই কাপড়ের পাজামা, পাঞ্জাবি। বেশ ভাবনা আছে। কত বছর এই পোশাক পরছেন?

উত্তরঃ এটা আমার তৈরি। আমার চিত্ত থেকে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইব বলে নয়। বছর পনেরো এই পোশাকেই। মঞ্চে গান গাওয়াটা কিন্তু শো-বিজনেসের মধ্যে পড়ে।

গান গাওয়াটা যে শো-বিজনেস তা প্রথম দেখান সুমন ও নচিকেতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশনে পীযূষকান্তি কলকাতার নাগরিক মঞ্চ ব্যবহারে নতুনত্বদেখিয়েছেন। গায়নের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনবত্ব ছিল। যেমন, কোনো রবীন্দ্রগীতি গাইবার আগেসেই গানে যে-রাগ ব্যবহার হয়েছে তা গেয়ে দেখাতেন। এটাকেন জানতে চাইলে তাঁর স্পষ্ট কবুলতি ঃ'উনিহচ্ছেন ফিউশন মিউজিকের স্রষ্টা। যত দেখি, তত অবাক মানি। শ্রোতাদের মধ্যে সেই অনুভুতিটা বেটে দিতে চাই। এলেম দেখাবার জন্য নয়।'
তবেএটা ঠিক যে পীযূষকান্তির সংগীত চর্চায় বহুদিনের প্রস্তুতি ছিল এবং এলেমের অভাব ছিল না। দেশি বিদেশি গান বেশ ভালোমত জানতেন। যদিও একা একা তাঁর গায়ন ক্যাসেটে শুনে তাঁর কেরামতি বোঝা যায় না। নিজেই জানিয়েছেন ঃ 'মঞ্চে আমি সাংঘাতিক দুঃসাহসী। যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহারে, গায়নভঙ্গিতে। ক্যাসেটেযা পারি না, সেই অভিব্যক্তি গুলো মঞ্চে করে থাকি।'

এইবারে তাহলে স্বচ্ছ হল কথাটা -পীযূষকান্তি একজন সব অর্থে 'আরবান পারফরমার'। এখনকার ভাষায় বলা চলে তাঁর 'টারগেট অডিয়ান্স' ছিল প্রধানত জিনস্ পরা ইংরিজি কপ্চানো তরুণ তরুণীরা এবং প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর অনেক অনুষ্ঠানে 'গেট ক্র্যাশ' করত। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেকে বসাতে চাইছিলেন দেবব্রত বিশ্বাসের শূন্য আসনে। কোনোকোনো সংবাদ-মাধ্যম তাঁকে রবীন্দ্রসংগীতের রবিনহুড বা স্পার্টাকাসের আখ্যা দিলেন। এ সবই তাঁর জনাদর বাড়াল, বিতর্ক টেনে আনল, গ্রামোফোন কোম্পানির যে কোনো নতুন প্রিন্টে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের অর্ডার যাচ্ছিল দশ হাজারের বেশি। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই জাতীয় ঘটনার সমাহার শিল্পী হিসাবে তাঁর মূল্য নির্ধারণে ভিন্নসুর জাগিয়ে দিল। তাঁর বিপুল সংখ্যক অনুরাগীদের পাশাপাশি সংশয়বাদীদেরও সংখ্যা বাড়ছিল।

একথা সত্যি যে রবীন্দ্রসংগীত গায়নের যে পূর্বাপর ঐতিহ্য তার সঙ্গে পীযূষকান্তির গায়নরীতি মেলেনি। একে তো তাঁকে উপস্থিত হতে হয়েছিল বেশি বয়সে, তার ওপর বিশ্বভারতী তাঁর গায়নে অনুমোদন দিতে রাজি হচ্ছিলনা, ফলে যেন একটা প্রতিশোধের মতো তিনি গড়ে তুললেন বিদ্রোহী গায়নের ধরন। ইংরিজি শব্দের আশ্রয় নিয়ে বলা যায় রবীন্দ্রসংগীতের musical value আর aesthetic value -রসঙ্গে তিনি আনতে চাইলেন cerebral value এবং সেইজন্যে গানে বিন্যস্ত শব্দের দিকে শ্রোতার মনকে বসাতে উদ্ভাবন করলেন দেহভাষার এক অভিনব প্রয়োগ। আলপনা রায় ব্যাখ্যাকরে বুঝিয়েছেন ঃ
পীযূষকান্তি গানে যুক্ত করেন নাটকীয়তা। স্বরক্ষেপণের ঝোঁকে অতি প্রবণ বা অতি তরল উচ্চারণে তিনি যেমন ধরেদিতে চান শব্দের অর্থ, তেমনি সুরের ওঠাপড়াকে দেখাতে চান হাতের আন্দোলন বা ভঙ্গিমায়। 'নীলঅঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়' গানের'অঞ্জনঘন' বা 'পুঞ্জ' শব্দের সুরের প্যাটার্নকে রূপ দিতেচান অঙ্গুলি সঞ্চালন বা মুদ্রায়, 'হেগম্ভীর' কথাটির উঁচু ও নিচু সুর দেখিয়ে দেন হাতের ওঠা-নামায়। কণ্ঠের সঙ্গে তাঁর শরীর তৈরি করে সজীব ছবি।...

পীযূষকান্তির ঋজু দেহ, বাউলসুলভ মুখাবয়ব, কণ্ঠ ও দেহের নাট্যভঙ্গি মঞ্চে সৃষ্টি করেছে আশ্চর্য সম্মোহ।... গানের অন্তর্লীন নাট্যকে পীযূষকান্তি দেখাতে পছন্দ করেন গানের শরীরে, শব্দের সত্য পৃথক-পৃথক করে বোঝানোয় তাঁর রুচি। এই নাটকীয়তাই হতে পারে তাঁর গান পছন্দও না-পছন্দের কারণ, এই কারণেই তাঁর গানকেউ বরণ করতে পারেন, কেউ প্রত্যাখ্যান। নিছক গায়নের তত্ত্বে গানের গ্রহণীয়তা বা প্রত্যাখ্যান ব্যাপারটি বেশ নতুন। সেই গায়ন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যক্তি শিল্পীর মর্জিতে,গান নির্বাচনেও নিশ্চয়ই তার ছাপ পড়ছে। পীযূষকান্তি সম্পর্কে সুভাষ চৌধুরীর মতান্তর অন্য এক দিক থেকে। তাঁর মতেঃ'বিতর্কিত শিল্পী' হয়ে ওঠার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ব্যতিক্রমী গায়নভঙ্গি -যা তথাকথিত রাবীন্দ্রিক নয় ...যে মানুষটির এরকম অসামান্য সুরঋদ্ধ কণ্ঠ, কণ্ঠের এরকম স্বরগ্রাম বিস্তৃতি, এই বয়সেও এরকম দম, যতি বিন্যাসের এমন উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে তাঁর প্রবেশ সুস্পষ্ট, তিনি অধিকাংশ শিল্পীদের মতো গান উদ্‌গার করেন না। তবুও পরিবেশনে এমন হাল্‌কা চমকের আশ্রয় নেন কেন?

হালকা চমকের প্রসঙ্গটি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এর মধ্যে প্রধানতম হল একই গানের ভিন্ন ভিন্ন ছত্রে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর প্রকাশ যা কোনোভাবেই মডিউলেশন নয়। কণ্ঠের চরিত্রটিই বদল করে দিতেন তিনি।.. এইভাবে কণ্ঠস্বর প্রয়োগের কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি জনপ্রিয়তা অর্জন ছাড়া। ...আমার মনে হয়েছে এটি গানে অতি নাটকীয়তার অভিব্যক্তি ।... এর সঙ্গে গানে যুক্ত হত বিশেষ বিশেষ শব্দ।

অপ্রয়োজনীয় ভাবে উচচকিত ভাবে ডচ্চারণ করা। মনে হত শব্দটির গুরুত্ব শ্রোতার সমাজে ঢুকিয়েই ছাড়বেন। কেন সমস্ত শ্রোতাকে একই ছাঁচে মেনে নিতেন ? এই চাপান-উতোরে আমাদের কোনো পক্ষ নেবার দরকার নেই, তবেযতদূর জানি এই বিশেষ গায়ন পদ্ধতি বেশ ভেবেচিন্তেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গায়নে বুদ্ধির যোগ ছিল। অবশ্য তিনি বেশি সময় পাননি। আকস্মিকভাবে গানের পালা শেষ করে তিনি অনেক দূরেচলে গেছেন। তবু বহুজনের প্রত্যাশাছিল তাঁকে ঘিরে। অনেকে ভাব ছিলেন২০০২ সালে বিশ্বভারতীর হাত থেকে অনুশাসন দণ্ডটি চলে গেলে পীযূষকান্তি হয়ে উঠবেন আরও কত সাহসী, গায়নে আনবেন আরও কত কৌশল, কিন্তু সেই আততি জমা রয়ে গেল।

৪

ইতিমধ্যে

এসে গেল ২০০২ সাল এবং দিকে দিকে মুক্ত রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যেতে লাগল। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনা ঘরগুলিতে প্রথম পরিবর্তনের ছোঁওয়া লাগল এবং বেরোতে লাগল নানাধাঁচের বই, বহুতর প্রচ্ছদ চিত্রে বিচিত্র তর রবীন্দ্ররচনা। ক্রমে দেখা গেল রবীন্দ্রকাহিন নিয়ে টি.ভি.সিরিয়ালের উপস্থাপন। তার অন্তর্গত চরিত্ররা হঠাৎ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে ওঠে-মানে তারমান সম্পর্কে খুব একটা ছুৎমার্গ নেই কারোর তরফে, প্রত্যাশাও নেই

শুদ্ধতার। 'স্বরবিতান' বিক্রি কিছুমাত্র কমেনি এবং ক্যাসেটে নামকরা শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের

সমাদর ম্লান হয়নি। শুধু একটা তরঙ্গ উঠল চারিদিকে যখন কুমারজিৎ নামধেয় একজন ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব সুরে ও গায়নে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত ক্যাসেট করে বার করলেন। সবাই ধিক্কার জানালেন এবং ক্যাসেটটি উধাও হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অদ্যাবধি সুর সন্ধানহীন' দুশোটির বেশি গানের তালিকা পেশ করেছেন সুধীর চন্দ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত ঃরাগ সুর নির্দেশিকা' বইতে। স্বত্বমুক্ত রবীন্দ্রপর্বে কেউ যদি এসব গানে সুর দিয়ে প্রচার করেন তাতে কোনো আইনি বাধা নেই, কিন্তু নীতির প্রশ্নে কেউ কেউ তর্ক তুলতে পারেন। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর ব্রাত্য-পর্বে পরিমল হোমের সুর-করা কয়েকটি রবীন্দ্রবাণী সভায় গাইতেন। সম্প্রতি সেই গানগুলি নিয়ে একটি ক্যাসেট বেরিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কয়েকটি রবীন্দ্র বাণীতে একসময় সুর করে ব্যক্তিগত ভাবে ক্যাসেট-বদ্ধ করে রেখেছিলেন, সম্প্রতি সেগুলিও বাণিজ্যিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের কোনো প্রয়াসই শ্রোতাদের সমাদর বা বিপণন পেয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। কাজেই কপি রাইট উঠে গেলে কী হবেভেবে যাঁরা শঙ্কিত হচ্ছিলেন তাঁদের পক্ষে কোনো বড় আঘাত এখনও আসেনি। স্বপন বসু ও তপন রায় লোকায়ত বাংলা গানের শিল্পীরূপে সমাদৃত ও যশস্বী। সম্প্রতি তাঁরা যোগ্য ট্রেনারের কাছে শিখে রবীন্দ্রনাথের বেশ কটি লৌকিক ছাঁচের গান ক্যাসেট করেছেন। তার প্রতিক্রিয়া মিশ্র। নচিকেতা তাঁর টিভি অনুষ্ঠানে('সা থেকে সা') মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন অকুতো ভয়ে।

কিন্তু রবীন্দ্রগীতিতে নতুনত্বের দিশা দেখাতে অকস্মাৎ আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। প্রথমে আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠানে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিদ্বজ্জন সমাগমে কয়েকটি গানগেয়ে এবং তারপরে 'অজানা খনির নূতন মণি' নামে ১২ টি রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বার করে তিনি শোরগোল তুলেছেন। তাঁরগানে উচ্চারিত রাগ রাগিণীর আয়োজন এবং রবীন্দ্রবাণীর অকিঞ্চিৎকরতা শুনে বহুজন লজ্জিত হয়েছেন। আমরা এ সম্পর্কে মতামত দেব না শুধু উদ্ধৃত করব কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য।
বিশেষজ্ঞ সুভাষ চৌধুরীর মতেঃ
তাঁরকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের এমন অসংলগ্ন রূপ কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। হতে পারে 'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ'
সংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় মনে করেন ঃ
এই অ্যালবামটি যদি রবীন্দ্রনাথের গানের বদলে অন্য কথায় রাগপ্রধান হত, তা হলে অনবদ্য অ্যালবাম আমরা উপহার পেতাম।
গায়িকা আলপনা রায়ের ভাষ্য ঃ
স্বত্ব তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল যে শঙ্কা, অথবা যা কখনওই হবে না বলে নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল অনেকের, তাই ঘটল এই ক্যাসেটে।
গায়ক অলক রায়চৌধুরীর মর্মবেদনা এই যে ঃ
হিন্দুস্থানি গানের সুরধর্মী সর্বস্বতার কাছে আর একবার লুণ্ঠিত হল রবীন্দ্রনাথের গানের বাক্‌প্রতিমা।
রবীন্দ্রনাথের মর্মজ্ঞ শঙ্খ ঘোষের স্পষ্ট উচ্চারণ ঃ
'অজানাখনির নূতন মণি' ক্যাসেটটি আমি বারবার শুনতে চাইব কিনা, তাহলে আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর হবে 'না'।...
রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলিতে এসব অতিরিক্ত রাগকৌশল আমার রুচি পছন্দের বাইরে।

অবশ্য এতসব বিদগ্ধ রসিক ও শিল্পীজনের বিরুদ্ধ মতামত ও তির্যক ব্যঙ্গ সম্পর্কে স্বয়ং অজয় চক্রবর্তীর প্রতিত্রিয়া অত্যন্ত নির্বিকার ও আত্মম্ভরিতায় অসহনীয়। তিনি স্পর্ধা ভরে অবিনয়ী অশিষ্টতায় বলেছেনঃ কে কী বলল, কে রবীন্দ্র স্বরলিপি অনুসরণকরে গাইনি বলে গাল পাড়ল,কী ধৃষ্টতা বলল, তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। তাদের কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনা।

আমাদের লেখা এবারে শেষ হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের মতো সংগীতকার সারা পৃথিবীতে এখনও দুজন আসেননি। কাজেই সেই অনন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি ও তার গায়ন প্রসঙ্গে যে বৃত্তান্ত এতক্ষণ আমরা লিখলাম তার পরিণামে মনে এল দিলীপ কুমারের সেই পূর্বকথিত উক্তিঃ 'আপনি... বাজে শিল্পীরদ্বারা আপনার গানের caricature নিবারণ করতে পারবেন না।' এই উক্তি আজ কিন্তু উল্টো ভাবে ফলে গেল। বাজে শিল্পীর দ্বারা নয়, মস্ত বড়ো এক ওস্তাদ অনিবারণীয় ঔদ্ধত্যে রবীন্দ্রনাথের গানে হস্তাবলেপ করে গেলেন।

স্বীকৃতিঃ রবীন্দ্রসংগীত রাগ-সুর নির্দেশিকা-সুধীর চন্দ। প্রবল প্রাণ -সুমন ভৌমিক সম্পাদিত। দিগঙ্গন ঃ মে-জুন-২০০৩, ২৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা।